Looking for the Enemy:
Mullah Omar and the Unknown Taliban

মোল্লা ওমরের রহস্যময় জীবন ও তালেবান আন্দোলনের আদ্যোপান্ত

লুকিং ফর দ্য এনিমি

লেখক: বেটি ড্যাম
ভাষান্তর: আবু বকর সিদ্দীক

লুকিং
ফর দ্য
এনিমি

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

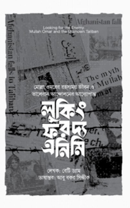

লুকিং ফর দ্য এনিমি
মূল : বেটি ড্যাম
অনুবাদ : আবু বকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২৪
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
আহমাদুল্লাহ ইকরাম
বানান ও সজ্জা
সাহিত্যসারথি
প্রকাশক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস
পরিবেশনা
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
বিক্রয়কেন্দ্র : দোকান নং ২১
কওমি মার্কেট (১ম তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৬৮-৮৬৪৪২৮
অফিস : বাড়ি ৩১৩/১৭/১২, উত্তর সানারপাড়, সারুলিয়া,
ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
০১৭৮৯৮৫৪৬০২
অনলাইন পরিবেশক
Rokomari - Wafilife
আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-০-৮

মুদ্রিত মূল্য
৫৯২৳

উৎসর্গ

প্রথম পুত্র
আইমান মুহাম্মাদ ওমরকে—
সৌভাগ্যের বার্তা হয়ে এসেছ ধরায়, শুভক্ষণে সুলক্ষণে।
মেতে উঠুক জগৎ, তব কীর্তিতে—
প্রশংসায় গানে ও গুণকীর্তনে।
জীবনের প্রতি বাঁকে,
অনন্ত মহাকালজুড়ে প্রতি ক্ষণে।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা/৯

অনুবাদকের কথা/১১

মুখবন্ধ/১৩

প্রথম অধ্যায়

আমাদের স্বার্থে আফগানযুদ্ধ? ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মোল্লা ওমরের খোঁজে ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

সোভিয়েত জিহাদে মোল্লা ওমর ৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

আফগান গৃহযুদ্ধ এবং মোল্লা ওমর ১১১

পঞ্চম অধ্যায়

তালেবানের উত্থান এবং অগ্রযাত্রা ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামি ইমারতের প্রধান মোল্লা ওমর ১৬৫

সপ্তম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির খোঁজে মোল্লা ওমর ১৯৫

অষ্টম অধ্যায়

মোল্লা ওমরের দেশে আরব অতিথি ২১৯

নবম অধ্যায়

নাইন-ইলেভেন এবং মোল্লা ওমর ২৬৭

দশম অধ্যায়

ওয়ার অন টেররের সূচনা, তালেবানের পতন এবং মোল্লা ওমরের আত্মগোপন ২৭৭

একাদশ অধ্যায়

মোল্লা ওমরের অন্তর্ধানের আদ্যোপান্ত ২৯১
উপসংহার/৩২১
সাক্ষাৎকার নেওয়া ব্যক্তিদের তালিকা/৩২৫
সহায়ক গ্রন্থাবলি/৩৩১
অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি/৩৩৫
বিশেষজ্ঞদের মতামত/৩৩৭
কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থিরচিত্র/৩৩৯

প্রকাশকের কথা

কাছাকাছি সময়ে গত হওয়া পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচিত ব্যক্তিদের তালিকা করা হলে নিঃসন্দেহে মোল্লা ওমর নামটি প্রথম সারিতেই থাকবে। এমনকি ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় আরও বহুকাল বিশ্বরাজনীতির টেবিলে এই নামের চর্চা ও বিশ্লেষণ জারি থাকবে। আফগান জাতির ইতিহাসে তো বটেই, ইসলামের ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এই নাম।

পৃথিবীর কীর্তিমান ব্যক্তিদের শৈশবও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম হয়। ছোটবেলা থেকেই তাদের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা হলেও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মোল্লা ওমর ছিলেন একেবারেই ভিন্ন। নিতান্ত সাদামাটা, স্কুল-পালানো, হেসে-খেলে জীবন কাটানো একজন সামান্য বালক—দরিদ্র সৎ বাবার ঘরে, নানারকম লাঞ্ছনা ও অবহেলা সহ্য করে আর দশটা আফগান শিশুর মতোই বেড়ে ওঠার পর, কোনোমতে প্রাথমিক শিক্ষাটা সমাপ্ত করে গ্রামের মসজিদের একজন সাধারণ মোল্লার চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এমন একজন মানুষ কীভাবে সময়ের গতিপথ বদলে দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন, তা যুগ যুগ ধরে মানুষের বিস্ময় বাড়িয়েই চলবে।

মূলত সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধই তার জীবনের মোড় পরিবর্তন করে দিয়েছিল। যুদ্ধের এমনই বিস্ময়কর ক্ষমতা। কেবল একজন ব্যক্তিকেই নয়, গোটা জাতিকেই পরিবর্তন করে দিতে পারে একটি যুদ্ধ। মোল্লার প্রথম জীবনটা নিদারুণ সাদামাটা হলেও তার সোভিয়েতযুদ্ধ-পরবর্তী জীবন অজস্র নাটকীয়তা ও অলৌকিকতায় ভরপুর ছিল। কিন্তু অসামান্য এই মানুষটা শেষ জীবনে নিজেকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করতেন। তাই তার কীর্তিময় জীবনের অধিকাংশই যেন এক বিশাল রহস্যের চাদরে আবৃত হয়ে আছে।

এই রহস্যের চাদর কিছুটা উন্মোচন করা যায় কি না, সেই চিন্তা থেকেই এক দীর্ঘ ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলাফল এই গ্রন্থ; যার পেছনে রয়েছে খ্যাতিমান ডাচ লেখিকা ও ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিক বেটি ড্যাম এবং তার প্রায় ১৫ বছরের দুঃসাহসিক অভিযাত্রা। এই রহস্যের অনুসন্ধানে ২০০৬ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অসংখ্যবার তিনি আফগানিস্তান ভ্রমণ করেছেন। চষে বেড়িয়েছেন কাবুল থেকে

কান্দাহার, হেরাত থেকে হেলমান্দের উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ ও এবড়োখেবড়ো সড়ক। ঘুরেছেন অজ পাড়াগাঁ থেকে উন্নত শহরে, ইট-পাথরের অট্টালিকা থেকে মাটির কুঁড়েঘরে। এই লক্ষ্যে তিনি তালেবানের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে মধ্যম ও সাধারণ সারির অফিসারদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাধারণ গ্রামবাসী ও মোল্লা ওমরের শৈশবের বন্ধু ও প্রতিবেশী, এমনকি দেশে ও বিদেশে থাকা তালেবানের প্রতিপক্ষ নেতাদের সাথেও বসেছেন, কথা বলেছেন।

১৫ বছরের দৌড়ঝাঁপের পর যে বিচ্ছিন্ন চিত্রগুলো তার সংগ্রহের ঝুলিতে বন্দী হয়েছে, তা পাজলের মতো একেকটি করে মেলানোর পর মোটামুটি যে চিত্রটা দাঁড়িয়েছে, সেটাই এই বই। তাই প্রথমে সবচেয়ে বিস্তৃত পরিসরে মোল্লা ওমরের রহস্যময় জীবনকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করতে পারার কৃতিত্বটা বলতে গেলে তারই।

বেটি ড্যাম পশ্চিমের মানুষ হলেও তার বইয়ের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি মোল্লা ওমরের জীবন ও তালেবান আন্দোলনকে দেখাতে চেয়েছেন পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে, স্থানীয় আফগানদের চোখে। যতদূর সম্ভব নির্ভর করেছেন স্থানীয় আফগান সোর্সের ওপর। তথাপি, মানুষ যেহেতু তার পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও সীমাবদ্ধতা থেকে বের হতে পারে না, লেখিকার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য।

যাইহোক না কেন, এটা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, পাঠক বইটির পাতায় পাতায় রহস্যের একেকটি জাল ভেদ করে এগিয়ে যাবেন এমন এক ক্যারিশমেটিক চরিত্রের দিকে, পর্দার অন্তরালে থেকে যিনি প্রস্তুত করে গেছেন সাম্রাজ্যবাদের শেষ কবরস্থান।

বিনীত,

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

ডেমরা, ঢাকা

২৬/০৭/২০২৪

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে আফগানিস্তান এবং তালেবান যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। দীর্ঘ ২০ বছর লড়াইয়ের পর সম্প্রতি তারা দ্বিতীয়বারের মতো আফগানিস্তানের মসনদ দখল করেছে। পালটে দিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি। আজকের এই তালেবানের উত্থান নব্বইয়ের দশকে কান্দাহারের একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে, অচেনা অজানা এক মোল্লার হাতে। এই গোষ্ঠীর উত্থান, সম্প্রসারণ, নেতৃবৃন্দ, পৃষ্ঠপোষক সবকিছুই যেন এক রহস্যময় পর্দায় আবৃত। সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও এর সর্বোচ্চ নেতা মোল্লা ওমরের মুখাবয়ব নিয়েও ছিল নানান বিতর্ক।

মোল্লা ওমরের জন্ম, পরিবার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সোভিয়েত যুদ্ধে ভূমিকা, তালেবানের সর্বোচ্চ নেতার আসনে আসীন হওয়া, বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক, আল-কায়েদার সাথে যোগসাজশের বিতর্ক এবং নাইন-ইলেভেন সংশ্লিষ্টতা, আত্মগোপন এবং মৃত্যু—এই সকল রহস্যের জট খুলতে এই বইটি অপরিহার্য। ডাচ অনুসন্ধানী সাংবাদিক বেটি ড্যাম মোল্লা ওমরের ব্যাপারে অনুসন্ধানকালে তালেবানের একটি সামগ্রিক চিত্রও তুলে এনেছেন। তালেবান ১.০-এর উত্থান-পতন এবং ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে তাদের সংগ্রাম বেটি ড্যামের ধারাবিবরণীতে চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। তালেবান ২.০-এর সাথে এর আগেকার সংস্করণের আদৌ কি কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতেও বইটি পাঠককে পথপ্রদর্শন করবে।

বইটি প্রকাশনায় যাদের চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সবশেষে প্রত্যাশা থাকবে বইটি সর্বমহলে সমাদৃত হোক এবং পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করুক, যেন এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারি।

বিনীত,

আবু বকর সিদ্দীক

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

ম-৫৬

মুখবন্ধ

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই বইটি ডাচ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনও ‘ইসলামিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান’ টিকে ছিল। সেই সরকারের প্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি। কিন্তু ইতিমধ্যেই আফগানযুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক অফিসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করে।

ঠিক এক বছর পর, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই দুপক্ষ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ২০২১ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রকে সকল সৈন্য প্রত্যাহারের সুযোগ করে দেয়। মার্কিনিরা এই চুক্তিকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ শান্তিপ্রক্রিয়ার সূচনা মনে করেছিল। কিন্তু তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। প্রস্তাবিত শান্তিপ্রক্রিয়া কখনোই আলোর মুখ দেখেনি। ২০২১ সালের গ্রীষ্মে মার্কিনিদের উপস্থিতি হ্রাস করা শুরু হয়। একইসঙ্গে আফগান সামরিক বাহিনী তালেবানের কাছে ধীরে ধীরে পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ হারায়। জেলার পর জেলা, প্রদেশের পর প্রদেশ। কদাচিৎ তীব্র লড়াই হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি বাহিনী তালেবানের কাছে আত্মসমর্পণ এবং চুক্তি করাকেই বেছে নিয়েছিল। কাবুল সরকার তখন এগুলোকে সাময়িক বাধা বলে প্রচার করছিল। শেষ পর্যন্ত ২০২১-এর ১৫ আগস্ট তালেবান কাবুলে প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট গনির তাৎক্ষণিক পলায়নের পর তারা ক্ষমতা দখল করে। মার্কিন সৈন্যরা তখন পুরোপুরি আফগানিস্তান ছেড়ে যায়নি।

যে গতিতে সরকারের পতন হয়েছিল তা সবাইকে, এমনকি তালেবানকেও অবাক করেছিল। তারা বর্তমানে নিজেদের সামরিক আন্দোলনকে সরকারের মতো কিছু একটাতে রূপান্তরের চেষ্টা করছে। এই চেষ্টা কতটুকু সফল হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। পুনরায় ক্ষমতায় আরোহণের পর তালেবানের শাসনামল কেমন হবে, তা বুঝতে পুরো বিশ্ব হন্তদন্ত হয়ে উঠেছে। ৯০-এর দশকে তালেবান যেভাবে নিজেদের পূর্বের শাসনকে পোক্ত করতে চেয়েছিল, সে সময়ের সঙ্গে এবারের স্পষ্ট মিল রয়েছে। বিশেষ করে নারীশিক্ষা ও নারীর কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের মতো প্রসঙ্গে অস্পষ্টতা, প্রতিহিংসামূলক হামলার হুমকি এবং কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রবণতার মতো বিষয়ে। তবে পূর্বের তালেবানের সঙ্গে এই তালেবানের বাহ্যিক কিছু ভিন্নতাও লক্ষণীয়। যেমন : সামাজিক গণমাধ্যম, ভিডিও এবং ছবির ব্যাপক ব্যবহার, ইউনিফর্ম পরা

নিরাপত্তাবাহিনী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ইত্যাদি। যাইহোক, আফগানিস্তান ও এর রাজনীতি সম্পর্কে গভীর এবং অর্থবহভাবে জানার জন্য এত বছরের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার পরও সাংবাদিক ও বিশ্লেষকদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো যেন ৯০-এর দশকেই আটকে আছে। মনে হচ্ছে যেন সামষ্টিকভাবে আমরা কিছুই শিখতে পারিনি।

বিগত ২০ বছর ধরে সামরিক ও নীতিনির্ধারক মহল এবং গণমাধ্যমের অগণিত ভুলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্রোধই হচ্ছে এই বইয়ের অনুপ্রেরণা। ওয়ার অন টেরর, রাষ্ট্রনির্মাণ প্রকল্প, কাউন্টার ইনসার্জেন্সির মতো বিভিন্ন কাঠামোর আলোকে আফগানিস্তানের ঘটনাগুলোকে শুধু আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও ব্যাখ্যা করা হতো। তাই সেসব ব্যাখ্যা ও বর্ণনাগুলো প্রায়ই পক্ষপাতদুষ্ট থাকত।

কৌতূহলও এই বইয়ের অন্যতম চালিকাশক্তি। বইটিতে মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ ও তার আন্দোলনকে তাদের ভাষায় এবং তাদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে, যা একেবারে ভিন্ন কিছু। বইটিতে আফগান দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে।

বেটির বহু বৎসরের গবেষণার মধ্যে নিয়মিতই তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হতো, বিশেষ করে আফগানিস্তানে তার কাটানো সময়ের শেষদিকে। বইটির প্রথম ডাচ সংস্করণ প্রকাশের এক সপ্তাহ আগে সে একটি নতুন সোর্সের সন্ধান পায়। মোল্লা ওমর তার জীবনের শেষের দিনগুলো কোথায় এবং কীভাবে কাটিয়েছিলেন—সেটার একটি নতুন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। আমরা বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে তখন আলোচনা করেছিলাম। বারবার আমরা বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ যাচাই করেছিলাম। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর এই জিনিসটিই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ ও সমালোচনার কারণ হবে। কারণ, বেটির এই বয়ান আফগান সরকার, মার্কিন সামরিক বাহিনী এবং অধিকাংশ পশ্চিমা মিডিয়ার প্রচলিত বয়ান, সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মোপলব্ধির পুরোপুরি বিপরীত।

ব্যাপক গবেষণালব্ধ হলেও বইটি কোনোভাবেই আফগানিস্তানের ঘটনাবলি, তালেবান আন্দোলন কিংবা মোল্লা ওমরের জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত নয়। তবে এটি আফগানিস্তান-বিষয়ক স্বল্পসংখ্যক বইয়ের একটি, যেখানে লেখিকা স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য শুনেছেন। তিনি জানা তথ্যের গণ্ডির বাইরে গিয়ে অস্পষ্টতা দূর না হওয়া পর্যন্ত সূত্র ধরে ধরে এগিয়েছেন। তালেবানের নতুন যুগে পদার্পণ, পুরো বিশ্বের সঙ্গে তাদের আচরণ এবং বিগত দিনের ঘটনাবলিকে তারা কীভাবে দেখে—সেগুলো জানতে এই বইয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মার্টিন ভ্যান বিওলার্ট

আফগানিস্তান অ্যানালিস্ট নেটওয়ার্কের সহপ্রতিষ্ঠাতা

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আফগানিস্তান-বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধির সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা

অক্টোবর ২০২১

প্রথম অধ্যায়

আমাদের স্বার্থে আফগানযুদ্ধ?

(২০১০)

ভোরের শিশিরে বাতাস তখনও সিক্ত। আজিজের বাগানে আমি আয়েশি ঢঙে হাঁটছি। যা শুনতে যাচ্ছিলাম সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও আমার ছিল না। কাজুবাদাম গাছের সারি ও সেগুলোর গোলাপি ফুলের মধ্য দিয়ে ন্যুব্জদেহী আজিজ আমার পাশ দিয়ে হাঁটছে। তার চেহারা আর পাঁচজন বয়োবৃদ্ধ দাদুর মতোই। তার স্বচ্ছ ভাঁজযুক্ত চামড়া ধূসর-সাদা লোমে ঢাকা পড়েছে। ক্ষুদ্র, গোল গোল দুটো চোখ এখনো প্রাণবন্ত। তার মাথায় ছিল মসৃণ, চকচকে ধূসর পাগড়ি আর পরনে লম্বা, ঢিলেঢালা সাদা কুর্তা। মঞ্চের পর্দা সরানোর মতো স্বাগতম জানানোর ভঙ্গিতে তিনি আমাকে তার সম্পত্তিগুলো দেখাচ্ছিলেন—সারি সারি গোলাপি বৃক্ষ।

তখন আজিজের বয়স ছিল কমপক্ষে ৭৫ বছর। তার স্মৃতিচারণ আমি এখনো খুব উপভোগ করি। তিনি আমাকে জানান, ‘পশতুদের নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াসে ১৯৬৪ সালে রাজা জহির শাহ যখন প্রথম সীমান্ত টানেন, সে সময়ও তিনি এই অঞ্চলে বাস করছিলেন। সহসাই এই এলাকাকে প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। আজিজ যেখানে বাস করতেন সেটা আফগানিস্তানের প্রায় মাঝামাঝি একটি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই প্রদেশটির নাম দেওয়া হয়েছিল উরুজগান। এই প্রাচীন পারসিক শব্দটির অর্থ হলো “দিনের মধ্যভাগ”। অর্থাৎ, যে সময় সূর্য আকাশের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকে।’

তিনি কীভাবে গোত্রীয় পদমর্যাদার শীর্ষে উঠে এসেছিলেন, সে ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কথা হয়। গোত্রে তার জীবন শুরু হয়েছিল অপরিচিত এক অনাথ শিশু হিসাবে। তার সৎবাবা তাকে ঘৃণা করত। ছোট্ট ভেড়ার পাল নিয়ে দিনের পর দিন তিনি উরুজগানের পাহাড়গুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। তার শান্ত চালচলনের জন্য একসময় তার গোত্র তাকে সম্মান করা শুরু করে। তারা তাকে পির উপাধি দেয়। সুফিবাদে আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শককে এই উপাধি দেওয়া হয়। অধিকাংশ আফগানই ইসলামের এই আধ্যাত্মিক ধারার অনুসারী। মুচকি হেসে আজিজ জানান, তিনি আসলে কোনো পির নন। গোত্রের লোকজন তাকে খুব ভালো মানুষ মনে করেই এই সম্মানজনক উপাধি দিয়েছিল।

ফিকে গোলাপি গাছগুলোর নিচে দাঁড়িয়ে সুফিবাদের এসব গল্পের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। আজিজ এরপর উরুজগানের রাজধানী তারিন কউতে তার সমর্থকদের কথা বলা শুরু করেন। ২০০১ সালের পর দেশটির নতুন শাসক হামিদ কারজাইয়ের ঘনিষ্ঠ মহলের একজন বনে যাওয়া এই মানুষটি হেসে বলেন, 'এখানে আমার শত্রুও কম নয়, একজন তো ওদিকেই থাকে।' যে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে আজিজের বাস, সেটা যেমন অবিশ্বাস্য আতিথেয়তা দেখাতে পারে, তেমনই সেরকম কঠোরও হতে পারে। অলিখিত নিয়ম ও রীতিনীতিতে চালিত সমাজে যোগ্যতমের বেঁচে থাকার প্রশ্নে এই কঠোরতা জরুরি। আজিজ আমাকে জানান, 'তালেবান শাসনামলে ওই প্রতিবেশী আমার জীবনকে এতটাই দুর্বিষহ করে তুলেছিল যে, আমাকে সাময়িক নির্বাসনে যেতে হয়েছিল।' আরও অনেকের মতো আজিজেরও নিজের ভাতিজার সঙ্গে শত্রুতা ছিল। এই গোত্রীয় সমাজে এরকম প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই কিংবা ভাতিজাকে 'তুরবুর' বলা হয়।

গল্পে গল্পে হঠাৎই আজিজ বলে ওঠেন, 'জানো বেটি, মোল্লা ওমরের বাড়ি আমাদের থেকে খুব নিকটেই।' তার শান্ত কণ্ঠে এটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আসল মোল্লা ওমর?' কারণ, এমন কিছু শুনতে পাব বলে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। কৌতূহলী হয়ে আমি তার আঙুলের ইশারা লক্ষ করলাম। তার আঙুল পশ্চিম দিকে তাক করা ছিল।

...

বেশ কিছুকাল ধরেই আমি আফগানিস্তানে বসবাস করছিলাম। আফগানিস্তান এবং এর প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ইতিমধ্যে একটি বইও লিখেছি। কিন্তু তারপরও মোল্লা ওমরের কথা মনে হলে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তিনিই সেই গ্রেট এনিমি, যিনি সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন। মোল্লা ওমর তালেবানের সেই রহস্যময় প্রধান, যিনি পুরো বিশ্বের টার্গেটে রয়েছেন। টুইন টাওয়ারে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২০০১ সালের পর থেকে ১০ হাজারের মতো মার্কিন সেনা শুধু এই মোল্লা ওমরকে খুঁজে বের করার দায়িত্বে ছিল। মার্কিনিদের মতে, তিনি ধনাঢ্য আরব সন্ত্রাসী ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছেন। আর তিনি যেহেতু বিন লাদেনকে নিরাপত্তা দিচ্ছিলেন, তাই বিন লাদেনের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান উড়িয়ে নেওয়া ছাড়া এমন কোনো অভিযোগ নেই, যেটা মোল্লা ওমরের ওপর আরোপ করা হয়নি। মোল্লা ওমরের অন্তর্ধানে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, তিনি আল-কায়েদার সঙ্গে মিলে আরও সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন এবং সেগুলো থেকে ইউরোপ ও মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নতুন হামলা করা হবে।

তবে মোল্লা ওমরের পেছনে লাগার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ৯০-এর দশকের শেষদিকে তার মৌলবাদী সরকারের চরম নিষ্ঠুরতা। বলা হয়, তিনি নারীদের ঘৃণা করেন। তার শাসনামলে মেয়েদেরকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং নারীদের বাইরে কাজ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শোনা যায়, তার শাসনামলে চুরির অপরাধে এমনকি নারীদের হাতও কর্তন করা হয়েছিল। এমনকি ইসলামি আইনের লঙ্ঘনে (ব্যভিচার) কিছু নারী অপরাধীকে পাথর মেরে হত্যা করার ঘটনাও ঘটেছিল। ফুটবল মাঠের মধ্যে নারীকে বসিয়ে গুলি করে মেরে ফেলার ঘটনাও তার শাসনামলে ঘটেছিল। মোল্লা ওমরের ধর্মীয় কট্টরপন্থা ছিল সর্বজনবিদিত। বলা হয়, তার নির্দেশেই প্রাচীন দুটি বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করা হয়। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে খুবই ক্ষুব্ধ করেছিল।

আর আজিজ আমাকে বলছে যে, সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ মোল্লা ওমরের বাড়ি এখান থেকে বেশি দূরে নয়! কথা বলতে বলতে আজিজ এমনভাবে হাঁটছিলেন যেন এটি খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। শান্ত স্বরে আজিজ জানান, ‘মোল্লা ওমরের পুরোনো বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়।’

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তার সঙ্গে কি কখনো আপনার দেখা হয়েছে?’

আজিজ মাথা নেড়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, স্বভাবতই অনেক দিন আগে। তখন তো চলতে-ফিরতেই সাক্ষাৎ হতো।’

আমি উঁচু একটি পর্বতশ্রেণির অপর পাশে মোল্লা ওমরের গ্রামের পানে চেয়ে ছিলাম। তার আগের বাড়ির এত কাছে এসে বেশ বিস্মিত হই। সেই বাড়িতে যাওয়া সম্ভব এমনটা আমি ইতিপূর্বে কল্পনাও করিনি। মার্কিন ও তাদের ন্যাটো মিত্ররা নিশ্চয়ই সেই স্থানটি সর্বদা নজরদারিতে রেখেছে। কে জানে, মোল্লা ওমর কিংবা তার কোনো যোদ্ধা ফেরত আসবে এই সম্ভাবনায় হয়তো কোনো ড্রোন ওপর থেকে সবসময়ই নজর রাখে।

...

২০০১ সালেও আফগানিস্তান সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানতাম না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার পরে শুরু হওয়া আফগানযুদ্ধ আমাকে প্রভাবিত করেছিল। কমিউনিকেশন সাইন্সের ২২ বছরের তরুণী ছাত্রী হিসাবে সে সময় পৃথিবীর তেমন কিছুই আমার দেখা হয়নি। নাইন-ইলেভেনের সময় আমি ঠিক করে জানতামও না যে, টুইন টাওয়ার আসলে কী! আমার বেড়ে ওঠা হল্যান্ডের গ্রামীণ দক্ষিণাঞ্চলে।

সেখানে আমরা সর্বোচ্চ ডাচ উপকূলীয় এক রিসোর্টে ঘুরতে যেতাম। গাড়িতে করে সেখানে যেতে দুঘণ্টা লাগত। তখন পর্যন্ত কেবল দুবার আমি বিমানে চড়েছিলাম।

চারপাশের সবার মতো আমিও ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বদা সমীহ করতাম। নাৎসিদের হাত থেকে আমার মাতৃভূমি হল্যান্ডকে তারাই মুক্ত করেছিল। তরুণ বয়সে আমাদেরকে একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মিত্রের চাক্ষুষ উদাহরণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হতো। অথচ এই দেশেরও কিনা শত্রু ছিল! নতুন এই শত্রুদের বিরুদ্ধে ওয়ার অন টেররের মাধ্যমে নিজের প্রতিরক্ষা করার গুরুত্ব তাই আমার ভালোভাবেই বুঝে এসেছিল। নাইন-ইলেভেনের হামলার পর পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শোকবার্তা পাঠায় এবং সেসব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় সমর্থন জানায়। আমার কাছেও এসব যথার্থ মনে হয়েছিল। কারণ, আমার মতে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমার এবং আমাদের জন্যই লড়াই করছে। মার্কিনিদের ওপর আমার ষোলোআনা আস্থা ছিল।

২০০৬ সালে ডাচ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সাংবাদিকদের উরুজগানে ক্যাম্প হল্যান্ড ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমার দেশীয়দের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের এই সুযোগ প্রথমবারেই আমি লুফে নিই। আমস্টারডামে পলিটিক্যাল সাইন্সের ডিগ্রি নেওয়ার পর তখন আমি সাংবাদিক হিসাবে *নোভাম নিউজ (Novum Nieuws)* নামের ছোট একটি ডাচ সংবাদসংস্থায় সবে যোগদান করেছিলাম। আমাদের পাঠকসংখ্যা যথেষ্ট নয় দেখিয়ে মন্ত্রণালয় প্রথমবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি প্রভাবশালী নারী ম্যাগাজিন *লিবেল (Libelle)*-এর শরণাপন্ন হই। ম্যাগাজিনটির জন্য আমি ফ্রিল্যান্সার হিসাবে বেশ কিছু কাজ করেছিলাম। এরপর সবকিছুই খুব দ্রুত হয়ে গিয়েছিল। কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি একটি নারী ম্যাগাজিনের হয়ে প্রথমবারের মতো আফগানিস্তানের পথে যাত্রা করি। স্যাটেলাইট ফোন হাতে খাকি প্যান্ট আর টিম্বারল্যান্ড বুট পরে একটি সামরিক পরিবহন বিমানে চড়ে হল্যান্ড থেকে আমরা তারিন কউতে পৌঁছাই। এ যাত্রায় আমাকে ধূসর ইউনিফর্ম পরিহিত সৈন্যদের মধ্যে গাদাগাদি করে বসতে হয়েছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল পুরুষ। তবে মোটের ওপর যাত্রাটি বেশ আরামদায়ক ছিল। যদিও আফগানিস্তানের আকাশসীমায় তালেবানের অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট মিসাইল থেকে বাঁচতে বিমানটিকে কিছুটা এলোমেলো গতিপথ নিতে হয়েছিল। পাইলট অবশ্য আগেই এ ব্যাপারে জানিয়ে রেখেছিলেন।

আফগানিস্তানে ন্যাটোর অগণিত সুসজ্জিত সামরিক ঘাঁটির একটিতে আমরা অবতরণ করি। ন্যাটোর কিছু অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাদের পরনে

ছিল পরিপাটি সবুজ জ্যাকেট। স্ট্রাইপস ও চকচকে মেডেল সেসব জ্যাকেটে শোভা পাচ্ছিল। ঘাঁটির পাথুরে রাস্তায় তারা এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাঁটত, যেন সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। চলমান যুদ্ধের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তারা অজ্ঞাত কিছু সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করত। এলইডি, এলডিএফ, টিআইসির মতো শব্দগুলো বুঝতে না পেরে আমার নিজেকে খুব বোকা মনে হতো। পাশাপাশি এতে করে তাদের প্রতি আরও বেশি সমীহ জন্মাত।[১] আবার ঘাঁটির বাইরের এলাকার দিকে ইঙ্গিত করে তারা সেটাকে ‘দুনিয়ার বুকে নরক’ বলে অভিহিত করত। তারা সাবধান করে দেয়, যেন কখনোই আমরা একাকী ঘাঁটির বাইরে না যাই। বাইরে যাওয়ার অর্থ হলো পরকালের টিকিট কাটা। কারণ, বাইরের সবকিছু তালেবান এবং আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রণ করে। তবে ন্যাটোর অফিসাররা আমাদের আশ্বস্ত করেন যে, সেনারা অচিরেই তাদেরকে চিরতরে খতম করে দেবে। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, বেঁচে থাকতে চাইলে সবসময় আমাদেরকে সৈন্যদের সঙ্গেই থাকতে হবে। একা একা ঘাঁটির বাইরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে আগ্রহী সাংবাদিকদেরকে ডাচ সেনাবাহিনী কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছিল। আমরা প্রায় সকলেই তা মেনেও নিয়েছিলাম।[২]

যাইহোক, সেনাবাহিনী আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। আফগানিস্তানের অপরিচিতি ও প্রতিকূলতার কারণে তাদের ওপর ভরসা করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প ছিল না। আমার মতো অজ্ঞ বেসামরিকদের জন্য তারা ব্যঙ্গাত্মক সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করত—নুকুবু। ডাচ ভাষায় যার পূর্ণরূপ দাঁড়ায় ‘বেহুদা জনসাধারণ’।

কিন্তু ঘাঁটিতে সময় কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানে মোতায়েনকৃত সামরিক বাহিনী এবং সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হতে থাকে। এক মার্কিন সেনা আমাকে জানায়, কঠোর নিরাপত্তাসত্ত্বেও একবার একদল তালেবান যোদ্ধা ঘাঁটির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল। এ কারণে সে সবসময় নিজের প্লেটের পাশে মেশিনগান রেখে খেতে বসে। ল্যাট্রিন পরিষ্কার করতে আসা আফগান পরিচ্ছন্নতাকর্মী আত্মঘাতী বোমাহামলা করে বসতে পারে এই আশঙ্কায় এক ডাচ সেনা আমাকে তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলেছিল।

এরকম একটি ঘটনার সাক্ষী আমাকেও হতে হয়েছিল। উরুজগানের ডাচ

---

[১] I.E.D.-এর পূর্ণরূপ Improvised Explosive Device, I.F.-এর পূর্ণরূপ Indirect Fire এবং T.I.C.-এর পূর্ণরূপ Troops in Contact.

[২] সাংবাদিকদের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, ‘Missie Waarheidsvinding’ [Establishing the Truth], an undergraduate thesis by Erik Beckers at Utrecht University, Holland.
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/31111

সেনাছাউনিতে একদিন একটি রকেট আঘাত হানে। আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ি। ভয়ে আমি কান্না করছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে, সুপ্রশিক্ষিত স্পেশাল ফোর্স ঘাঁটির বাইরের সেই আততায়ীদের ধাওয়া করে ধরে ফেলবে। কিন্তু এক ঘণ্টা পর সেনারা খালি হাতে ফিরে এলে সত্যিকার অর্থেই আমি পরিস্থিতি নিয়ে ভীত হয়ে পড়ি। তারা শুধু আক্রমণকারীদের ব্যবহার করা লাইট সুইচের সঙ্গে যুক্ত একটি তার খুঁজে পেয়েছিল। কারা রকেটহামলা করেছিল সেটাও অস্পষ্ট ছিল। যদিও সেনারা হামলাকারীদের স্যান্ডেল পরা গুন্ডা বলে উপহাস করত, তবে আমাদেরকে প্রায়ই তাদের হাতে নাকানিচুবানি খেতে হতো।

অপারেশন মেডুসা নিয়ে আন্দ্রে নামক একজন ডাচ কমান্ডোর সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর এই সামগ্রিক অভিযানের ব্যাপারে আমার মধ্যে আরও বেশি সন্দেহ কাজ করতে থাকে। অভিযানের নামকরণ করা হয়েছিল গ্রিক মিথোলজির মেডুসার নামে। এই মেডুসার দিকে কোনো পুরুষ তাকালেই সে পাথরে পরিণত হতো। তবে নিশ্চিতভাবেই আফগানিস্তানে মোতায়েন করা ডাচ সেনাবাহিনী এবং গ্রিক নারী মেডুসার শক্তিমত্তার মধ্যে ন্যূনতম সম্পর্কও ছিল না। আন্দ্রে আমাকে একটি ঘটনার কথা জানান। একদিন কমব্যাট স্টেশনে লাঞ্চের সময় হঠাৎ করে তাদের ঘিরে ফেলা হয়। তাদের ওপর বৃষ্টির মতো বুলেট এবং রকেট নিক্ষেপ করা হয়। সেই আক্রমণের কথা স্মরণ করে তার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, ‘সেদিন আমাদের অবস্থা হয়েছিল খাঁচার ভেতর বন্দী ইঁদুরের মতো।’ অবিশ্বাস্যভাবে তাদের কেউ সেদিন নিহত হয়নি। তবে হামলার পরও তালেবান যোদ্ধাদের সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা করা যেত না এবং এই বিষয়টিই ছিল তার আতঙ্কের সবচেয়ে বড় কারণ।

এসব কারণে একদিন ঘাঁটির বাইরে টহলদলের সঙ্গে আমাকে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি মাথা নেড়ে না করে দিয়েছিলাম। এজন্য মন খারাপ হলেও আমার কাছে বিকল্প কিছু ছিল না। আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, যেকোনো অবস্থাতেই আমি সেই মরুভূমিতে যাব না। আমাদের সেনাদের ওপর থেকে ততদিনে আমি সকল আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম। বিশ্বের সবচেয়ে দামি অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পেরে উঠছে বলে মনে হচ্ছিল না। তবে আমি কখনো তাদের এটা বলার সাহস পাইনি। সেদিন আমি ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে ক্যাম্পেই রয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন হল্যান্ডের উদ্দেশে বিমানে করে ফিরে আসছিলাম, তখন আমার মাথায় হতাশা, উদ্বেগ এবং অগণিত প্রশ্ন এসে জমা হয়। আমার ধারণায় ছিল যে, তারা আমাদের জন্যই লড়াই করছে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিরা কি এটা বুঝতে পেরেছিল যে, সমগ্র অভিযানটি কতটা খারাপ যাচ্ছিল? বলা হয়,

বিশ্বের সমুদয় তথ্য আমাদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদের নখদর্পণে থাকে। তবে আফগানিস্তানে তারা কেন এতটা অসহায় ছিল?

হল্যান্ডে ফিরে পুনরায় আমি আমার স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রতিদিনই আমার দরজায় রেখে যাওয়া *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন (International Herald Tribune)*-এর প্রথম পাতায় আফগানিস্তানের বিভিন্ন লোমহর্ষক ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। সেখানে ন্যাটো সৈন্যদের ওপর হামলা, আফগানদের হতাহতের ঘটনা এবং তালেবানদের শক্তি সম্পর্কে আমি বিভিন্ন লেখা পড়তে থাকি। তখন থেকেই আমি মনে মনে এসবের উত্তর খুঁজতে থাকি।

...

হল্যান্ডে ফিরে আসার ছয় মাস পর আমস্টারডামে সন্ত্রাসবাদবিষয়ক একটি কনফারেন্সে আমি জেসন এমেরিন নামক এক মার্কিন কমান্ডোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি ২০০১ সালেই আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। সে সময় আমি তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যের গল্প শুনতে খুব বেশি আগ্রহী ছিলাম না। তাদের থেকে প্রতিনিয়তই বলা হতো যে, সন্ত্রাসীদের পরাজিত করা আর মাত্র কয়েক মাসের ব্যাপার। কিন্তু তার গল্পে এমন কিছু ছিল, যা শেষ পর্যন্ত আমাকে আফগানিস্তান নিয়ে প্রথম বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। জেসন এমেরিন আমাকে জানান, 'তালেবান শাসনব্যবস্থার পতন ঘটাতে নাইন-ইলেভেনের পরপরই আফগানিস্তানে মোতায়েন করা প্রথম কমান্ডোদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তারা আফগান নেতা হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তবে কারজাই সে সময় তেমন পরিচিত কেউ ছিলেন না। কিন্তু শীঘ্রই তিনি আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।' প্রচলিত আছে, এমেরিনের টিম কারজাইকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। এই ভূমিকার জন্যই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মার্কিন সেনাবাহিনীও এমেরিনকে তার ভূমিকার জন্য পার্পল হার্ট পদবিতে ভূষিত করেছিল। এরিক ব্লেইমের বেস্টসেলার *The Only Thing Worth Dying For : How Eleven Green Berets Fought for a New Afghanistan* নামক বইটিতে তার অভিযানগুলোর বর্ণনা রয়েছে। এই বইটি মূলত এমেরিন এবং তার টিমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়। কিন্তু লেখক বইটিতে আফগানদের তেমন কোনো আলোচনাই করেননি।

আফগানিস্তানে এমেরিন কারজাইয়ের গোত্র পোপালজাইয়ের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। উরুজগানে তখনও পোপালজাইদের উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই বিষয়টিই আমাকে আগ্রহী করে তোলে। এমেরিনের কথা বলার

সময় আমি একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভিন্নকিছু ভাবছিলাম। সেই আফগানরা কি আমাকে তাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে পারবে? ক্যাম্প হল্যান্ডে রকেটহামলাকারীদের ব্যাপারে তাদের কি কোনো ধারণা আছে? তারা কি আমাকে জানাতে পারবে যে, কেন সেই সন্ধ্যায় স্পেশাল ফোর্স এতটা হতাশ হয়ে পড়েছিল?

আমি এমেরিনের কাছ থেকে আরও কিছু শুনতে আগ্রহী ছিলাম। আমি উরুজগানকে তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি দ্রুতই উপলব্ধি করি যে, তিনি যে আফগানদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের সম্পর্কে জানতে হলে আমাকে ভিন্নকিছু করতে হবে। আমার মনে হয়েছিল, শুধু সেই আফগানদের দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলি শুনে এবং উরুজগানের একটি বিশদ চিত্র পেলেই আমি ক্যাম্প হল্যান্ডের সেই ঘটনার সামগ্রিক বিষয় অনুধাবন করতে পারব।

যাইহোক, এমেরিনের বলা আফগান নামগুলোর জটিল বানান আমি আনাড়িভাবে লিখে নিই। যেমন, মুয়ালিম রাহমাতুল্লাহ, রোজি খান এবং আজিজ আগা পির জান। এমেরিন আমাকে জানান, ‘এসব ব্যক্তি উরুজগানের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং তারা সবাই এখনো সেখানেই বসবাস করছেন।’ তাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্থানীয় আমলা, আরেকজন ছিলেন মেয়র এবং আরেকজন ছিলেন ডাচ সেনাবাহিনীর ঘনিষ্ঠ মিত্র। তাদের নামগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছিল, যেন সেই ভয়ংকর মরুভূমি এক বছর আগের চেয়ে আমার নিকট অনেক বেশি সহজগম্য হয়ে গেল। ডাচ মিডিয়া রিপোর্টগুলোতে সেখানকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ থাকে না। অথচ পশ্চিমা সাংবাদিকরা চাইলেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত। কিন্তু কাউকেই সম্ভবত তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলাই হয়নি।[৩]

আমি এমেরিনকে জানিয়েছিলাম যে, আমি সেই আফগানদের সাক্ষাৎকার নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি আমার এই কথায় কর্ণপাত করেননি। এর বেশ কয়েক বছর পর আমি তাকে আমার বইয়ের ইংরেজি সংস্করণের এক কপি পাঠাই। আমি আশাবাদী ছিলাম যে, তিনি আমার প্রশংসা করবেন। কিন্তু আফগান সোর্সদের বয়ানের কারণে

---

[৩] সেই সময়ে হল্যান্ডের দৈনিক সংবাদে আধিপত্য বিস্তারকারী মেইনস্ট্রিম ডাচ মিডিয়ার জার্নালিস্টরা প্রধানত ডাচ সেনাবাহিনীর নিরাপত্তায় আফগানিস্তানে নিউজ কভার করতেন। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, মিনকা নিঝুইস। তিনি ২০০৬ সালে উরুজগান থেকে ডাচ সংবাদপত্র ট্রুউ *(Trouw)*-এর জন্য স্বাধীনভাবে নিউজ কভার করতেন। পরবর্তীকালে দে ভোল্কস্ক্রান্ট *(De Volkskrant)* পত্রিকার ডিডি ডার্কসেন একাকী কাবুল থেকে নিউজ কভার করেন। তিনি উরুজগানও পরিদর্শন করেছিলেন। ডাচ সাংবাদিক আর্নল্ড কারস্কেনস ক্যাম্প হল্যান্ড থেকে রিপোর্ট করার বদলে স্থানীয় গভর্নর জান মুহাম্মদ খানের মিলিশিয়াদের সঙ্গে থেকে নিউজ কভার করতেন।

তিনি হতাশ হন।[৪] আমার বই সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, 'আফগানরা ভালো গল্পকার' এবং সঙ্গে এও যোগ করেন যে, 'আমি মোটেও পক্ষপাতশূন্য নই।'

...

যাইহোক, আমি এমেরিন থেকে শোনা নামগুলো কাবুলের ডাচ দূতাবাসের মার্টেন ডি বোয়েরকে ই-মেইল করি। ক্যাম্প হল্যান্ডে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাকে দেখে আমি সে সময় বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ, তিনিও সামরিক ঘাঁটির উঁচু দেয়ালের বাইরের ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে উৎসুক ছিলেন। মার্টেন সেই নামগুলো পড়েই তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি কাদের বোঝাতে চাচ্ছি। তিনি নিশ্চিত করেন, সেসব ব্যক্তি তখনও নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

তিনি খুব দ্রুতই ই-মেইলের উত্তর পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আজিজ আগা পির জানের নাম উল্লেখ ছিল। এই আজিজই আমাকে পরবর্তীকালে তার বাগানে দাঁড়িয়ে মোল্লা ওমরের পুরোনো বাড়ি সম্পর্কে জানান। ই-মেইলে বলা হয়েছিল, আজিজ বর্তমানে কাবুল সফরে এসেছেন। মার্টিন লিখেছিলেন, 'আপনি তার মাধ্যমে আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারেন। তবে আপনাকে এটা দ্রুত করতে হবে। তিনি এখানে মাত্র তিন দিনের জন্য এসেছেন।' আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে, 'আমি এখনই রওনা দিচ্ছি।' সে সময় বাণিজ্যিক ফ্লাইটে আফগানিস্তানে ভ্রমণ করা এবং ক্যাম্প হল্যান্ডকে মধ্যস্থতাকারী না রেখেই আফগানদের সাক্ষাৎকার নেওয়া যেত। কিন্তু ২০০৭ সালে খুব কম সাংবাদিকই এমনটা করেছিলেন।

সামরিক প্রহরা ছাড়াই আফগানিস্তানে যাওয়া নিয়ে আমার সে সময়কার বয়ফ্রেন্ড খুব চিন্তিত ছিল। আমি যখন তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম, তখন সে আমায় বলেছিল, 'সেনাসদস্যরা তো কিছুটা হলেও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।' যাইহোক, একাকী আফগানিস্তানে যাওয়ার বিষয়টি ফোনে আমার পরিবারকে জানাই। তারা সে সময় নর্দার্ন হল্যান্ডে বসবাস করত। তাদের সঙ্গে আমার একটি দীর্ঘ এবং জটিল কথোপকথন হয়। ২০০৩ সালে প্রথমবারের মতো ইরাকে যাওয়ার সময় আমি আমার বাবা-মাকে আগে থেকে বলিনি। কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, কীভাবে আমি তাদেরকে বিষয়গুলো বোঝাব। আর এখন সেই ফোনকলটি তাদের জন্য ছিল আরেকটি ধাক্কা। আমার কিছু আত্মীয় আফগানিস্তানকে বলত 'বিকৃত মস্তিষ্কের মুসলমানদের' একটি দেশ। তাদের কল্পনায় সেখানকার বাসিন্দারা একে অপরকে টুকরো টুকরো করার জন্য সর্বদা ওত পেতে থাকে। তবে তারা বর্ণবাদী নয়।

---

[৪] Bette Dam, A Man and a Motorcycle : How Hamid Karzai Came to Power (Utrecht Ipso Facto, 2014).